ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণ :

প্রশ্ন ঃ ভাবার্থ কাকে বলে ?

উঃ মূলত গদ্য ও পদ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশকে মূল ভাব বজায় রেখে সহজ সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাকেই ভাবার্থ বলে।

প্রশ্ন ঃ ভাবার্থ লিখতে গেলে কোন বিষয়ের উপর নজর রাখতে হয় ?

উঃ ১. মূল অংশে যা দেওয়া আছে তা হুবহু লিখে দিলে চলবে না। আসলে তার আড়ালে লেখক যা বলতে চাইছেন সেটাকে সহজ করে প্রকাশ করতে হবে।

২. মূল অংশের তুলনায় ভাবার্থ অনেকটাই আয়তনের দিক থেকে ছোটো হবে।

প্রশ্ন ঃ ভাবসম্প্রসারণ কাকে বলে ?

উঃ সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া গদ্য বা পদ্যের অংশ থেকে অন্তর্নিহিত অর্থ বের করে তাকে শৈল্পিক গদ্যে প্রকাশ করাকেই ভাবসম্প্রসারণ বলে।

প্রশ্ন ঃ ভাবসম্প্রসারণ রচনায় কোন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হয় ?

উঃ ১. উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা বা কোন রচনার অংশ তা জানানোর প্রয়োজন নেই।

২. ভাবসম্প্রসারণে মূল রচনার অন্যান্য তথ্য এনে হাজির করা দরকার হয় না।

প্রশ্ন ঃ ভাবার্ষ ও ভাবসম্প্রসারণ শৈলি ছাত্র-ছাত্রীদের কোন্ কাজে লাগে ?

উঃ ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণ রচনার দক্ষতা অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজস্ব ভাব প্রকাশে সমর্থ হয় এবং লেখনি শিল্পে পরিপক্ক হয়ে ওঠে।

ঘ. ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণ

কোন গদ্যাংশ বা পদ্যাংশের মূল ভাবকে সহজ সরল করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করাকেই বলে ভাবার্থ। কোন বিষয় পাঠের মূল অর্থ জানার জন্য এটির আশু প্রয়োজন। ভাবার্থ লিখতে গেলে যে বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে হবে—

১. মূল অংশে যা দেওয়া আছে তা হুবহু লিখে দিলে চলবে না। আসলে তার আড়ালে লেখক যা বলতে চাইছেন সেটাকে সহজ করে প্রকাশ করতে হবে।
২. মূল অংশের তুলনায় ভাবার্থ অনেকটাই আয়তনের দিক থেকে ছোটো হবে।
৩. ভাবার্থে উদ্ধৃতি, সমাসবদ্ধ পদ এবং অর্থ-অলংকার বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।
৪. মূল অংশে বিশেষ করে গদ্যে যদি কোন কাহিনি থাকে তাহলে তাকে সংক্ষেপে লিখতে হবে।
৫. মূল রচনাটি যে লেখকের তাঁর নাম উল্লেখ না করাই ভালো।
৬. ভাবার্থ অংশটি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সর্বদাই নিজের ভাষায় লিখতে হবে।
৭. ভাবার্থ লিখতে হবে প্রথম পুরুষে।

কয়েকটি উদাহরণ —

ভাবার্থ-১

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি ঠাঁই পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময়
মানবের সুখে-দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়"

ভাবার্থ: মানব জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে তাই কেউ যেতে চায় না। প্রকৃতির নিয়ন্তা হিসাবে সূর্য পৃথিবীকে আরও মধুময় করে তুলেছে। তাই এর রূপ রস সৌন্দর্য উপহার স্বরূপ গ্রহণ করে মানুষ বেঁচে থাকে।

ভাবার্থ-২

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধি আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,

পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজনে সর্বক্ষণে চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কেন মতে
যে জাতি চলেনা কভু, তারি পথ 'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।"

ভাবার্থ : জীবনের গতি থেমে গেলেই জীবন অসার। শাস্ত্রের অনুশাসন, আচার, সংস্কার কিংবা ধর্মের সংকীর্ণতা মানতে গিয়ে জীবন বদ্ধ হয়ে যায়। তাই নদী আর মানুষের জীবন তুল্যমূল্য।

ভাবার্থ-৩

"বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আনি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।"

ভাবার্থ : আত্মবলই শ্রেষ্ঠ বল। তাই সচেতন মানুষ ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করে যে সে যেন বিপদের সঙ্গে লড়াই করে নিজের আত্মবল প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই মানুষের জীবনে যত ক্ষতি ও বঞ্চনাই আসুক না কেন, তার আত্মবিশ্বাক কখনোই ভেঙে পড়ে না।

ভাবার্থ-৪

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উষ্ণমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ধারিত স্রোতে

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়–
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,–
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

ভাবার্থ : ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় কাপুরুষতা, কূপমণ্ডুকতা, এবং কুসংস্কারের বন্ধন ছিনন করতে না পারলে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যাবে না। পরাধীনতার শৃঙ্খলে এক সময় দেশবাসীর পৌরুষের প্রকাশ ঘটেনি। তাই মনুষত্ত্বের বিকাশও রুদ্ধ হযে গিয়েছিল। উদার ভারতবর্ষ ধরতে গেলে আগে সেই ভয়শূন্য মনোভাবের দরকার।

ভাবার্থ-৫

"হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক্
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা।
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমাচাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

ভাবার্থ : রূঢ় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রোমান্টিকতার রূপরেখা বদলে যায়। তখন নরম কবিতা কঠিন গদ্যের রূপ ধারণ করে। ধুলো মলিন বাস্তব পৃথিবীতে কবি তখন রোমান্টিকতার আধার স্বরূপ চাঁদকে ঝলসানো রুটি তথা প্রয়োজনের সামগ্রী রূপেই দেখেন।

ভাবার্থ-৬

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্ব-শিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই। এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, যেখান থেকে তারা একটা বিদ্যার ধন, লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে বাকী জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণ

সাপেক্ষ; অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়,—ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধি-বৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জাগ্রত করতে পারেন; এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের প্রয়োজন মত বিদ্যা অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজেকে করতে হয়। গুরু উত্তর-সাধক মাত্র।

ভাবার্থ : শিক্ষা অর্জিত সম্পদ। যে শিক্ষা নিচ্ছে তার সাধনার উপরেই শিক্ষা সচেতনতা নির্ভরশীল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য কর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। এক্ষেত্রে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ শিক্ষার্থির অন্তরের শক্তি জেগে ওঠেন তাই অনুভূতি স্তর বাড়াতে না পারলে প্রকৃত শিক্ষাকে ছোঁয়া যায় না।

ভাবার্থ-৭

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য সাধন করে। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপ-প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশে মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক ? কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ—যে যোগ জ্ঞানের যোগে, যে যোগ সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

ভাবার্থ : মানুষের মিলনে প্রকৃত জ্ঞানের ভূমিকাই বড়ো। জ্ঞানই পারে মানুষকে সীমাবদ্ধতার গণ্ডী মুক্ত করে উদার স্তরে পৌঁছে দিতে। দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে। কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্য যে আমরা সেই জ্ঞানের প্রকৃত রূপকে আজও অনুধাবন করতে পারি নি।

ভাবার্থ-৮

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন।

তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই ; দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে—এমন কি সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।

ভাবার্থ : ৩২ বছর বয়সী চন্দ্রশেখর সংসারী নন। মাতৃবিয়োগের পর দারগ্রহণ করেন নি। তাই নিজের হাতেই রান্না করে খান। পাঠ্য পুস্তক, প্রাপ্ত অর্থের সঠিক হিসাব পান না। তাই তিনি ভেবেছেন বিয়ে করলে এসব সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ভাবার্থ-৯

বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র্য থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে চলেছে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো; এও সেইরকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে ... অন্যদিকে ধনের সন্ধান, ধরে অভিমান, ভোগ-বিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত আরাম, আরোগ্য, আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে।

ভাবার্থ : বর্তমান সভ্যতায় একদল মানুষ উৎপাদন করছে আর একদল মানুষ তার ফল ভোগ করছে। উৎপাদকের দল চিরকালই পঙ্গু, আর অন্যেরা ভোগবিলাসী। পল্লি উৎপাদন করে আর নগর আরাম করে। অল্পসংখ্যক মানুষ শিক্ষা পায় আর বাকিরা বঞ্চিত হয়।

ভাবার্থ-১০

দেশের মঙ্গল ? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল ? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের কয় জন ? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ— দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে ? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায়

থাকিবে ? কি না হইবে ? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

ভাবার্থ : দেশের অধিকাংশ লোকই যেখানে কৃষিজীবী সেখানে তাদের মঙ্গলই প্রকৃত মঙ্গল। অথচ আমাদের দেশে বিপরীত চিত্রই দেখা যায়। কৃষিজীবীরা প্রতিবাদ করলে তার ফল ভিন্ন হতে বাধ্য।

ভাবসম্প্রসারণ

ভাবের হ্রাস বৃদ্ধি সাহিত্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কাব্য ও কবিতায় কবি বৃহত্তর ভাবকে গুটিকয়েক শব্দে ধরতে চান। আর সেই শব্দগুলির মধ্যেই কবির অভিপ্রায় বা চিন্তন নিহীত থাকে। শ্রেণিকক্ষে অধ্যাপকমণ্ডলী কর্তৃক তাই ভাব বিশ্লেষণ তথা ভাবসম্প্রসারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় লক্ষ রাখা দরকার —

১. উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা বা কোন রচনার অংশ তা জানানোর খুব একটা প্রয়োজন নেই।

২. ভাবসম্প্রসারণে মূল রচনার অন্যান্য তথ্য এনে হাজির করা দরকার হয় না।

৩. ভাবসম্প্রসারণ করতে হবে সম্পূর্ণ নিজের ভাষায়।

৪. বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য সমাজ জীবন, পৌরাণিক কাহিনি বা অন্য পাঠের বিশেষ অংশ এনে হাজির করারক্ষেত্রে বাধা নেই।

৫. ভাবসম্প্রসারণের ভাষা হবে অত্যন্ত সহজ সরল।

৬. আয়তনের দিক থেকে ভাবসম্প্রসারণে তেমন কোন সীমাবদ্ধতা নেই.

৭. বিষয় ব্যাখ্যায় যেন কোনো বিতর্ক এসে না পড়ে।

ভাবসম্প্রসারণ-১

না জানি কেনরে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

কলকাতার সদরস্ট্রিটের বাড়িতে থাকার সময় একদিন সকালে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের স্নিগ্ধ আলো কবির চোখে আসে। সেই বিশেষ ক্ষণে, জ্যোতির্ময় আলোয় কবির মনের উপর থেকে হঠাৎই পর্দা সরিয়ে দেয়। বদ্ধতা, আর সংকীর্ণতা থেকে কবির মুক্তি ঘটে, বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলন-প্রত্যাশায় কবি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। প্রভাত সূর্যের আলোই যে কবির প্রাণে প্রবেশ করে তাঁর অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগকে জাগিয়ে তুলেছে, তা কবিতার সূচনাতেই বলা হয়েছে।

মানুষের দুটি সত্তা— বদ্ধ সত্তা বা ছোটো আমি, যাকে বলা হয় অহং; আর মুক্ত সত্তা বা বড়ো আমি, চিরন্তন মানব সত্তার সঙ্গে যার সম্পর্ক। সন্ধ্যা সংগীতের যুগ পর্যন্ত

কবি বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন নি, মহামানবের স্বরূপ অনুভব করতে পারেন নি। আপনার মধ্যে আপনি আবদ্ধ ছিলেন, অন্ধকারের মধ্যে বিষণ্ণভাবে কাটাচ্ছিলেন। আজ প্রভাত সূর্যের আলোয় সেই অন্ধকার, সেই স্বপ্নদশা ঘুচে গিয়ে চিত্তের জাগরণ ঘটেছে।

ভাবসম্প্রসারণ-২

আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা।
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

প্রকৃতির নিত্য একটি ক্রিয়া সূর্যোদয়ের বিশেষ একটি মুহূর্ত কবিপ্রাণে যে জাগরণ খটিয়েছে, সেই উপলব্ধির প্রকাশ আলোচ্য কবিতাটি। কবির ঐকান্তিক ইচ্ছাকে কবি নির্ঝরিণীর রূপকে আড়ালে প্রকাশ করেছেন।

কবির বহুদিনের সুপ্ত বাসনা হঠাৎ অন্তরের আলোতে যখন জাগ্রত হয়ে উঠল, তখন তাঁর আবেগ বিশ্ব প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অদম্য গতিতে ছুটে চলল মুক্তির সন্ধানে। কবি তাঁর নিজের কার্যধারাকে নির্ঝরিণীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন তিনি তাঁর কাব্যধারাকে সারা পৃথিবীতে তিনি ঢেলে দিতে চান তাঁর কাব্য করুণাধারা। নদী যেমন তারা দুকূলকে প্লাবিত করে উর্বর শস্যশালী করে তোলে, অন্যদিকে তার ছুটে চলার পথের প্রতিবনন্ধকতাকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পৃথিবীর বুকে ঢেলে দেয় করুণা ধারা। ঠিক কবিও তেমনি বিভিনন্ন দেশের সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে এসে মানুষের উৎকর্ষতাকে বাড়ানো চেষ্টা করেছেন। পরে তিনি তাদের শিক্ষা সম্পাদন করে সাফল্য লাভ করেছেন। তাই তো তিনি বিশ্ব কবিতে ভূষিত হয়েছেন। বিশ্ববাসী তাঁর কাব্যের বিভিন্ন ধারার সাহিত্য রসে মুগ্ধ হয়েছে।

ভাবসম্প্রসারণ-৩

স্মৃতি পিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরি কণা

অতীতমুখি স্মৃতি চারণায় কবি প্রণয় বিহ্বল অবস্থাটিকে অনুভব করেছেন। মোট তিনটি স্তবকে রচিত সমগ্র কবিতার শেষ স্তবকে কবিতা সমাপ্তির দুই পঙক্তির আগে এই পংক্তি দ্বয়ের প্রয়োগ ঘটেছে । মৃত মাধুরির কণা নিয়ে স্মৃতি চারণার মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তি খুঁজেছিলেন। প্রবাহিত কালে যুগে যুগে এই ক্ষয় বৃদ্ধির নিত্যকলা চলতেই থাকে। ক্ষণবাদী কবির ক্ষণ স্থায়িত্ব বোধই তাঁকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে হারিয়ে যাওয়া প্রেমের মাধুরি-কথাকে

ভুলতে দেয় নি।

বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রেমকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে তা আধুনিক যুগের জটিল মনস্তত্ত্বেই পরিচয়বাহী। দুই চোখে নীল স্বপ্ন-মেঘে কোন বিদেশিনী যদি ধরা দিয়ে চলে যায় তাহলে প্রেমিকের চোখে একটা আক্ষেপ তো থাকবেই এবং এই আক্ষেপের জন্যই সেই প্রিয়াকে ভোলা সম্ভব নয়। প্রকৃতির জগতে অন্যান্য উপাদানের মধ্যেই তার অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়। কিন্তু অন্যের অন্তরাগে সে যখন বর্তমান প্রেমিককে ছেড়ে চলে যায় তখন তা একই সঙ্গে অপমানের এবং বেদনার। একদিন প্রিয়তমের নাম যার রসনা তুষ্ট হত এবং যার জিহ্বায় বার বার উচ্চারিত হত। সে যখন অন্যের দিকে ভালোবাসার হাত বাড়িয়েছে এই আশঙ্কায় কবি হৃৎপিণ্ড ভেঙে চুড়ে যায় এবং একটা হতাশা গ্রাস করে কিন্তু আশাবাদী কবি সেই স্মৃতির দহনকে জয় করে যাবতীয় অসম্মান ও প্রত্যাখ্যানের জ্বালাকে সর্বজয়ের মধ্যে দিয়ে পরম তৃপ্তি আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ঠিক এই মুহূর্তে কবির প্রেম শাশ্বত হয়ে উঠেছে।

ভাবসম্প্রসারণ-৪

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাটিতেছি পৃথিবীর পথে,

পথ পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে কবির যাত্রা শুরু হয়েছে। হাজার বছর ধরে পথ চলার সাধারণ অর্থ হতে পারে— অনেকদিন ধরে পথ চলা। কিন্তু এখানে কথাটির আর একটা গভীর অর্থ আছে। কবি অন্তরে একটু শান্তি পেতে চেয়েছিলেন, একটু ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলেন, যা বেঁচে থাকবার অবলম্বন। সেই ভালোবাসা বাস্তব সংসারে খুঁজে না পেয়ে তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির মধ্যে খুঁজেছেন। বাংলা সাহিত্যের বয়স তখন হাজার বছর। বাংলা সংস্কৃতি, বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের। এই হাজার বছরের বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস তিনি পাঠ করেছেন। তার মধ্যে খুঁজেছেন তৃপ্তি বা শান্তি। কিন্তু কবির যা মানসিকতা, তাতে পুরনো দিনের গতানুগতিক কাব্যধারার মধ্যে তিনি তৃপ্তি পাননি। অথচ, যে সব সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল বা ভ্রমণকাহিনির মধ্যে খুঁজে বেড়ানোর জন্য তিনি ক্লান্ত হয়েছেন। সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত-অতৃপ্ত কবিকেই শেষ পর্যন্ত দু'দণ্ড শান্তি দিতে পেরেছে বর্তমানের, বাস্তবের, অনেকেরই যেন চেনা নাটোরের বনলতা সেন। কবিতার চরণগুলোতে এক রোমান্টিক কুহক রচনা করেছেন—মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তির অতীত স্তরে—পরিচিত এক রহস্যময়তার জগতে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছে। কবি শুধু অতীত ইতিহাসের অন্ধকারে অবগাহন করে সেদিনের শিল্পের ও সৌন্দর্যের জগতেরই জাগরণ ঘটাননি, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নময় রূপকথার মায়ারাজ্যের এক ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয় তো সঙ্গে জড়াও অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও।

নিসর্গের পরশ সারা গায়ে মেখে কবি যে শৈশব কাটিয়েছিলেন, যৌবনে এসে নবীন কিশোরকে তার উত্তরাধিকার করে দিতে চান। নবীন কিশোর যেন কবির শৈশবের স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়। কিশোর বয়সে বোতামহীন ছেঁড়া শার্ট, আর ফুসফুস ভরা হাসি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন পূর্ববঙ্গের নদী-মাঠ-ক্ষেত ভালোবেসে, মাথার ওপর থাকত ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ, দুপুর রৌদ্রে কৈশোরের চঞ্চলতা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন মাঠের পর মাঠ অজানা আনন্দে, আবার ক্লান্ত শরীরে রাত্রে চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। যৌবনে নগর কলকাতায় এসে কফি হাউসে কফিতে চুমুক, আর সিগারেটের ধোঁয়া খেতে খেতে কেটে যেত দিনরাত্রি, কয়েকটি নারীর সান্নিধ্য লাভে কবির আনন্দে কেটেছে সেসব দিন। পুরানো পোশাকগুলি কবির বড় প্রিয় ছিল, আজ সেগুলি তাকে আর মানায় না। তাই এই সমস্ত কিছু ত্রিনি দিয়ে যেতে চান উত্তর প্রজন্মের নবীন কিশোরকে। নবীন কিশোর ইচ্ছে করলে গ্রহণ করতে পারে আবার ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কবি তো জোর করতে পারেন না। শুধু কবি নবীন কিশোরের বয়সি সব কিছু দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কবি চনা না নবীন কিশোর শৈশবের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হোক।

ভাবসম্প্রসারণ-৬

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা

কবির আত্মকথনে সমৃদ্ধ, তাঁর স্বদেশপ্রীতির অমোঘ প্রকাশ কবিতাটির মধ্যে লক্ষ করা যায়। এক সৈনিকের জবানিতে কবি সেই দেশপ্রেমের কথা প্রকাশ করেছেন। বীর সৈনিক বিশ্বের নানা যুদ্ধক্ষেত্রে অবিরাম সংগ্রাম করে জয়ের স্বাদ লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করে তাদের দুঃখ মোচনে সপল হয়। তাদের অন্ধকার সময়কে তাড়িয়ে দিয়ে নিয়ে আসে স্বপ্নময়, আলোময় প্রাণ প্রবাহের জগৎ। অপরদিকে তার স্বদেশভূমি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ দারিদ্র্য অনাহারে ক্লিষ্ট বন্যা, ঝড়, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে বিপর্যস্ত। কিন্তু তাদের সেই যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান সহজে ঘোচে না।

কবি তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা বোধ করেই নিজেকে বাতিওয়ালার মতো মনে হয়। কারণ যে বাতিওয়ালা প্রতি সন্ধ্যায় শহরের বুকে আলো জ্বেলে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, অথচ তার নিজের ঘরেই জ্বলে না আলো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিপর্যস্ত দারিদ্র্য, অভাব-অনটনের অপুষ্টির অন্ধকারে সে প্রতিনিয়ত দিশাহারা। তাই রাজপথের এক সাধারণ দরিদ্র বাতিওয়ালার জীবনের সঙ্গে কবি বীর সৈনিকের জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পান। এর তাৎপর্য হলো দেশের জনথ্য দশের জন্য, অন্ধকার দূর করতে সমর্থ হলেও বীর সৈনিকের ব্যক্তিগত জীবন ঘন

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সৈনিকের জীবন যথার্থভাবেই বাতিওয়ালার জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে সমাজতান্ত্রিক কবির দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

ভাবসম্প্রসারণ-৭

শিকড়ে শিকড়ে মাথা খুঁড়ে মরে

সাধারণ নির্যাতিত মানুষদের একত্রিত হওয়ার জন্য কবি আহ্বান জানিয়েছেন। কবিতার প্রথম স্তবকেই কবি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের আভাস চিত্রিত করেছেন। আর দ্বিতীয় স্তবকে এই বিপ্লব আরও গভীর হয়ে উঠেছে মিছিলের এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে। আসলে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে এ দেশবসীর জীবনযাত্রা ছিল ছন্নছাড়া। জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছিল অতীষ্ট। এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে কবিতার কথায় আন্দোলনের মধ্যে কবিতায় রূপকের মধ্যে তুলে ধরেছন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্ব মুহূর্তে বনস্পতিগুলি আরোগ্য কামনা করে, ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য। ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তে তাঁদের সর্বাঙ্গে পরিস্ফূটিত হয় পতনের ভয়। আসলে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এখানে রূপকের আড়ালে বোঝাতে চেয়েছেন যে, শাসক আর শোষকের অত্যাচারে সমাজের অবহেলিত নিপিড়িত নির্যাতিত শ্রমজীবীর দল যখন সম্মিলিতভাবে গণবিপ্লবের জোয়ার নিয়ে আসবে তখন বনস্পতির মতোই শাসক ও শোষকের দল মৃত্যু ভয়ে হয়ে উঠবে ভীত। যে শাসক শ্রেণি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দিনের পর দিন অপরকে পুড়িয়ে এসেছে এখন তারা নিজেরাই বিনাশের ভয়ে ক্রন্দন করছে।